র‍্যাবের রিপোর্ট কার্ড

গোলাম মোর্তোজা ও আহসান কবির

সুমন কী জানতেন কেন তাকে ধরা হয়েছিল?
সম্ভবত না।

সুমন কোনো সন্ত্রাসী নয়। তার নামে থানায় কোনো মামলা ছিল না। সুমনের ভয় ছিল সন্ত্রাসীদের নিয়ে। সন্ত্রাসীরা তাকে আক্রমণ করতে পারতো। কারণ সুমন ছিল আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী। আহসানউল্লাহ মাস্টারকে যারা হত্যা করেছে তারা চাইছিল না সুমন সাক্ষী দিক। এরকম অবস্থায় সুমনকে গ্রেপ্তার করলো র‍্যাব। মারা গেলেন সুমন। র‍্যাব লাশ ফেরত দিতে এলো থানায়। ওসি লাশ গ্রহণ করলো না। র‍্যাব ঘোষণা দিল 'ধস্তাধস্তিতে' হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে সুমন।

সুমনের সমগ্র শরীরে পাওয়া গেল আঘাতের চিহ্ন। ধস্তাধস্তিতে শরীরে আঘাতের চিহ্ন তৈরি হলো কীভাবে? র‍্যাব উত্তর দেয়নি এই প্রশ্নের। উত্তর পাওয়া গেছে ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে। আঘাত অর্থাৎ অত্যাচারের কারণেই নিহত হয়েছেন সুমন। কোনো সন্ত্রাসী সুমনকে হত্যা করেনি। হত্যা করেছে সরকারি বাহিনী র‍্যাব।

সুমনকে কী কারণে হত্যা করা হলো, সেটা কেউ জানে না। জানতো না সুমনও।

সুমনের বাবা-মা-পরিবার এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর?

সুমনকে হত্যা করার আগে র‍্যাব একটি প্রশংসার কাজ করেছিল। তারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল সন্ত্রাসী পিচ্ছি হান্নানকে। তাদের এই কার্যক্রম দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। জনগণ আশায় বুক বেঁধেছে, এবার সন্ত্রাসী ধরা পড়বে। কিন্তু হঠাৎ করেই জনগণ দেখলো র‍্যাবের কার্যক্রম কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। তারা ছোট সন্ত্রাসী বা সাধারণ মানুষ ধরছে এবং পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এখন পর্যন্ত তাদের হাতে নিহত হয়েছে আটজন। এর মধ্যে কেউই বড় কোনো সন্ত্রাসী নয়। একেবারে সাধারণ মানুষ আছেন কয়েকজন।

মোঃপুরের দলিল লেখক মোঃ আলীকে ঘর থেকে টেনে বের করে এনে গুলি করে হত্যা করেছে। মোঃ আলী নিহত হওয়ার পর র‍্যাবের এক সদস্য মৃতদেহের ওপর ছাব্বিশ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করেছে। অবিশ্বাস্য এবং লোমহর্ষক হলেও বাস্তবে এমনটাই ঘটেছে। মোঃ আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। র‍্যাবের এই অভিযোগের ভিত্তি নেই। তারপরও ধরে নিলাম র‍্যাবের অভিযোগ সত্যি, মোঃ আলী সন্ত্রাসীদের শেল্টারদাতা। এই অভিযোগে কী কাউকে গুলি করে হত্যা করা যায়? মৃতদেহের ওপর বর্ষণ করা যায় ছাব্বিশ রাউন্ড গুলি? মানুষ খুন করার এই লাইসেন্স র‍্যাবকে কে দিয়েছে?

সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে রসিকতা করা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ছোট করা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পেশাগতভাবে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আমুদে এবং কৌতুকপ্রিয়। কৌতুক চর্চা নাকি তাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি।

মহাখালীর নিউ ডিওএইচএসে বসবাসরত পরিচিত এক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা বলেছেন, আগে থানা পুলিশের পেট্রল টিম যে কাজ করতো; কালো পোশাক, কালো চশমা, কালো টুপি পরা যমদূত চেহারার র‍্যাব সদস্যরা এখন সেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাসা-বাড়িতে কমান্ডো অভিযান চালিয়ে তারা দেহপসারিণীদের ধরছে। র‍্যাবকে (RAB) এখন থেকে তাই র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন না বলে 'রেজিমেন্ট অ্যাগেইন্স্ট ব্রোথেল' বলাই ভালো হবে!

র‍্যাব কমান্ডো স্টাইলে কিছু অভিযান পরিচালনা করছে। গভীর রাতে মানুষের বাড়ির দরজা-জানালা ভাঙছে। অভিযোগ ছাড়াই মানুষকে পিঠমোড়া করে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কাকে ধরতে এসেছিল আর কাকে ধরছে সেটা সব সময় হিসাব করছে না। এরকমই একটি অভিযান চালিয়েছে ডিওএইচএসে এক সামরিক কর্মকর্তার বাসায়।

অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল সিরাজুল ইসলামের বাসায় তান্ডব চালানোটা ছিল নাকি নিতান্তই মিস্ ফায়ার। র‍্যাব সরি বলেছে। এছাড়া সোর্সের 'সামান্য ভুল'ও হতে পারে। এই ধরুন যে বাড়ির ঠিকানা ১৯১/১, সেটাকে সোর্স ১৯১ বলে চালিয়ে দিয়েছিল। সোর্সের তথ্য যাচাই করার প্রয়োজন মনে করেনি র‍্যাব। এই সোর্স নিয়ে কথা হচ্ছিল একজন সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে।

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা বললেন, তাহলে সোর্সের গল্প শুনুন। এটা নিতান্তই কৌতুক গল্প। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কালা জাহাঙ্গীরকে ধরতে গিয়েছে র‍্যাব। সোর্স তাদের বলে দিয়েছে, কালা জাহাঙ্গীরের ছেলে তার বাড়ির সামনে বসে প্রায়শই আম খায়। র‍্যাব সদস্যরা নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এলো। পাশাপাশি দুটো বাড়ি। কোনটিতে ঢুকবে তারা? দেখলো একটি বাড়ির সামনে বসে আম খাচ্ছে এক ছেলে। র‍্যাব তার কাছে জানতে চাইলো তোমার বাবা বাসায় আছেন? ছেলেটি বললো 'হ্যাঁ'। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়িতে ঢুকে হামলে পড়লো র‍্যাব। জিনিসপত্র ভাঙলো। তছনছ করলো সাধের আসবাবপত্র। পিঠমোড়া করে বাঁধলো কাউকে কাউকে। অতঃপর কালা জাহাঙ্গীরকে না পেয়ে বাসার সবাইকে সরি বলে র‍্যাব সদস্যরা ফিরে এলো ছেলেটির কাছে। ছেলেটিকে ঝাড়ি মারতেই সে বললো, 'বাবা ঠিকই বাসায় ছিল, এখন আর নেই। কিন্তু আপনারা যে বাড়িতে ঢুকেছিলেন সেটি আমাদের বাড়ি নয়!'

বাংলা বা হিন্দি ছবিতে সন্ত্রাসী নায়কদের গ্ল্যামারাইজ করা হয়। কাব্য করে ডায়ালগ শানানো হয়, 'কেউ সন্ত্রাসী হয়ে জন্মায় না। সমাজই তাকে সন্ত্রাসী বানায়।' ঠিক তেমনি কেউ কিন্তু র‍্যাব হয়ে জন্মায় না। আর্মি, নেভি, পুলিশ কিংবা বিডিআরে চাকরি নেবার পর কাউকে কাউকে র‍্যাবে পোস্টিং দেয়া হয়।

বাজারে প্রচলিত আছে র‍্যাব সদস্যদের নেয়া হয়েছে নাকি বাছাই করে। বিশেষ করে পুলিশে যারা সৎ অফিসার হিসেবে পরিচিত তাদেরকেই নেয়া হয়েছে র‍্যাবে। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি একটু ভিন্ন রকম। র‍্যাবে প্রথমে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সিনিয়র এসপিদের। আর্মি থেকে আসবে লে. কর্নেল। উভয়ের পদমর্যাদা সমান হবে। কমান্ডার হিসেবে থাকবেন তারা।

পরবর্তীতে দেখা গেছে আর্মির ক্যাপ্টেনরা নেতৃত্বে থাকছেন। ফলে সিনিয়র এসপিরা আর আসেননি র‍্যাবে। পরে পুলিশ থেকে আনা হয়েছে এএসপিদের। কোনো বাছাই ছাড়া গ্রুপ ধরে আনা হয়েছে তাদের। গ্রুপ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে বৃহত্তর ফরিদপুরে যাদের বাড়ি তাদের এবং হিন্দু, বৌদ্ধদের। তবে র‍্যাবে আসা পুলিশের সদস্যদের মধ্যে ভালো পুলিশের সংখ্যা কম নয়। তারা কাজ করতে চাইছে। কিন্তু পদমর্যাদাগত জটিলতায় তারা কাজ করতে পারছে না।

বিসিএস দিয়ে এসপি হয়েছেন যারা তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন আর্মির ক্যাপ্টেন। এটা তারা মানতে পারছেন না। আবার কিছু বলতেও পারছেন না। আর্মির হাবিলদার এবং পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরদের বিচার করা হচ্ছে একই কাতারে। এটাও র‍্যাবের ভেতরে

> অপারেশন ক্লিন হার্ট শেষে যখন নিহত মানুষদের স্বজনরা মামলা দায়ের করছিলেন, যখন সেনা কর্মকর্তাদের আদালতে হাজির হবার উপক্রম হচ্ছিল, তখন তাদের ভেতরই হার্ট ডিজিজের উপক্রম হয়েছিল। এই 'হার্ট ডিজিজ' সংক্রমিত হয়ে পড়ে সরকারের ভেতর। কি আর করা? দেয়া হয় কড়া এন্টিবায়োটিক ডোজ, যার নাম ইনডেমনিটি। যাতে নিহতদের স্বজনরা কোনো বিচার না পায়। র‍্যাবও কি সেদিকে এগুচ্ছে? ভবিষ্যতে ইনডেমনিটি কি হবে তাদের রক্ষাকবচ?

একটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোনো সমন্বয় নেই র‍্যাবের কর্মকান্ডে। অভিযোগ রয়েছে র‍্যাবের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈশম্য। আর্মি থেকে যারা এসেছেন তারা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। র‍্যাবের আর্মি কমান্ডাররা ফ্রি মোবাইল ব্যবহার করছেন। পুলিশের এএসপিদের ব্যবহার করতে হচ্ছে নিজেদের মোবাইল। সোর্সরা আর্মি কমান্ডারদের বিশ্বাস করতে পারছেন না। র‍্যাবের সোর্সের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এরকম নানাবিধ কারণে র‍্যাবের কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, '৯১ থেকে '৯৬ পর্যন্ত সন্ত্রাসের দায়ে জেলখাটা সাবেক ছাত্রদল কর্মী যারা কিনা পুলিশে চাকরি নিয়েছিল, তাদেরও কাউকে কাউকে আনা হয়েছে র‍্যাবে। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে 'জন্ম নিয়ে' র‍্যাবে আসা সদস্যদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশ একুশজনে। তাদের দেয়া হয়েছে অত্যাধুনিক উজি গান, স্নাইপার, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, এলএমজি, এসএমজি, ইলেকট্রিক গান, এসএমসি শটগান ইত্যাদি। হেলিকপ্টার দেয়ার চিন্তা-ভাবনাও নাকি চলছে।

কি রঙ হবে সেই হেলিকপ্টারের? র‍্যাব সদস্যদের পোশাকের মতো কালো? কি নাম হবে সেই হেলিকপ্টারের? ব্ল্যাক হক? ভালোই। কল্পনা করতে আরো ভালো লাগে। দুরন্তগতিতে ছুটে আসা উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকে জেমস বন্ড কিংবা মাসুদ রানার মতো র‍্যাব সদস্যরা নেমে আসবে রাস্তায়। আর রাস্তায় দৌড়াতে থাকা কিংবা গাড়িতে ধাবমান কালা জাহাঙ্গীর কিংবা পিচ্চি হান্নানদের জাপটে ধরবে তারা। ডায়ালগ ঝাড়বে, 'শয়তান, র‍্যাবের একজন সদস্য বেঁচে থাকতেও কালা, পিচ্চি, গলাকাটা, নাককাটা কিংবা মুরগি মিলনরা এখন থেকে আর মাস্তানি করতে পারবে না।' অথবা সোনারগাঁও, শেরাটনের ভেতরে থাকা সুন্দরী যৌনকর্মীদের জাপটে ধরে গ্রেপ্তার করে বলবে, 'এখন থেকে তোরা আর কাউকে নষ্ট করতে পারবি না।'

কিন্তু সমস্যা থেকেই যায় এক-আধটু। ধরুন আপনারা দুই বন্ধু। একই সঙ্গে এইচএসসি পাস করেছেন। একজন গেলেন সামরিক বাহিনীতে, অন্যজন ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করার পর পুলিশে যোগ দিলেন। ট্রেনিং শেষ করে এএসপি হবার পর দেখা গেল তার সেই বন্ধু সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়েছেন। দু'জনই র‍্যাবে পোস্টিং পেলেন একসময়। এখন কে সিনিয়র? এই অদ্ভুত এক সমস্যা ভর করেছে র‍্যাব সদস্যদের ভেতর। নিজেদের ভেতর দ্বন্দ্ব, গালাগালি, ডিসিপ্লিন ব্রেক করার ঘটনা নাকি ঘটছে নিয়মিত।

আর পুলিশ? বাংলা নামের দেশের নাকি সৎ মায়ের সন্তান তারা। তাদের চেয়ে আর্মির বাজেট অনেক অনেক গুণ বেশি। পুলিশের কাজের পরিধি ব্যাপক। তবু কেন যেন মানুষ আর্মিকেই ভয় পায়। জাতিসংঘ মিশনে গিয়ে নিহত হওয়া সেনা সদস্যরা যে সম্মান পান, সন্ত্রাসী ধরতে গিয়ে নিহত হওয়া পুলিশ সদস্যরা তার ধারেকাছেও নাকি যেতে পারেন না। লে. কর্নেল (অবঃ) সিরাজুল ইসলামের বাসা তছনছ করার পর র‍্যাব সরি বলেছে। কিন্তু পিরোজপুরে সন্ত্রাসী ধরতে গিয়ে একজন এএসপির বাসায় তান্ডব চালিয়ে আসামি ধরতে না পেরে ফিরে আসার সময় র‍্যাব সদস্যরা নাকি সৌজন্যসূচক সরিও বলেননি। কেন এমন হয়? রক্ষী বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্তকে যেমন মেনে নিতে পারেনি সে সময়ের সেনাবাহিনীর সদস্যরা, ঠিক তেমনি র‍্যাবকেও সন্দেহের চোখে দেখছে সাধারণ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা।

পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত সেই সামরিক কর্মকর্তা, যার কথা লেখার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি আরো একটি মজার মন্তব্য দিয়েছেন। তার মতে সেনাবাহিনীর সদস্যদের শত্রু নিধনের জন্য অস্ত্র শিক্ষা দেয়া হয়। ক্যান্টনমেন্টে থাকলে তারা অস্ত্র পায় কিন্তু শত্রু পায় না। বাইরে এসে কথিত সন্ত্রাসীদের শত্রু ভেবে তারা হত্যা করা শুরু করে। অপারেশন ক্লিন হার্টের সময় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত হয়েছিলেন ৫৮ জনের বেশি মানুষ। অথচ পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করলে আইনের হাতে তুলে দেয়া হতো।

সেনা কিংবা নৌবাহিনী, পুলিশ কিংবা বিডিআর থেকে র‍্যাবে এসে সেই একই মানসিকতা পোষণ করছে তারা। কুষ্টিয়ায় জুম্মন খান, মিনার, ঢাকার শাহজাহান, দলিল লেখক মোহাম্মাদ আলী কিংবা টঙ্গীতে নিহত এমপি আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকান্ডের প্রধান সাক্ষী যুবলীগ নেতা সুমন। অপারেশন ক্লিন হার্টের সময় বলা হতো আর্মির ভয়ে 'হার্ট ডিজিজে' মারা যাচ্ছে সন্ত্রাসীরা। র‍্যাবও কি এমন হার্ট ডিজিজ নিয়ে হাজির হয়েছে?

তবে অপারেশন ক্লিন হার্ট শেষে যখন নিহত মানুষদের স্বজনরা মামলা দায়ের করছিলেন, যখন সেনা কর্মকর্তাদের আদালতে হাজির হবার উপক্রম হচ্ছিল, তখন তাদের ভেতরই হার্ট ডিজিজের উপক্রম হয়েছিল। এই 'হার্ট ডিজিজ' সংক্রমিত হয়ে পড়ে সরকারের ভেতর। কি আর করা? দেয়া হয় কড়া এন্টিবায়োটিক ডোজ, যার নাম ইনডেমনিটি। যাতে নিহতদের স্বজনরা কোনো বিচার না পায়। র‍্যাবও কি সেদিকে এগুচ্ছে? ভবিষ্যতে ইনডেমনিটি কি হবে তাদের রক্ষাকবচ? তাহলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন থেকে তাদের নতুন নাম হবে র‍্যাপিড ইনডেমনিটি ব্যাটালিয়ন বা 'রিব'। এমন হলে তো পুলিশের নিরাপত্তা হেফাজতে যতোজন মারা গেছে সেই ইয়াসমীন থেকে শুরু করে রুবেল, সীমারানী থেকে শুরু করে জামান ফকির- এসব হত্যাকান্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘাতক পুলিশকে আগে ক্ষমা করে দেয়া উচিত। ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত ইয়াসমীনের ধর্ষক ও খুনি পুলিশরা কি এখন সেই প্রশ্ন তুলবে না?

ক্লিনহার্টের হত্যাকারীদের ইনডেমনিটি দিয়ে আপাত দৃষ্টিতে মুক্ত হয়েছেন বলে ভাবছেন। কিন্তু একটি বিষয় হয়তো তারা ভুলে গেছেন, আইন করে কোনো হত্যাকান্ডের বিচার বন্ধ করা যায় না। কোনোদিন যে আদালত এই ইনডেমনিটি অবৈধ ঘোষণা করবে না, এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না। এ বিষয়টি র‍্যাব সদস্যদের মনে রাখা প্রয়োজন।

সুমনকে হত্যা করার আগে র‍্যাব একটি প্রশংসার কাজ করেছিল। তারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল সন্ত্রাসী পিচ্ছি হান্নানকে। তাদের এই কার্যক্রম দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। জনগণ আশায় বুক বেঁধেছে, এবার সন্ত্রাসী ধরা পড়বে। কিন্তু হঠাৎ করেই জনগণ দেখলো র‍্যাবের কার্যক্রম কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। তারা ছোট সন্ত্রাসী বা সাধারণ মানুষ ধরছে এবং পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এখন পর্যন্ত তাদের হাতে নিহত হয়েছে আটজন। এর মধ্যে কেউই বড় কোনো সন্ত্রাসী নয়। একেবারে সাধারণ মানুষ আছেন কয়েকজন

একটি র‍্যাব কাহিনী

Z_vKw_Z a¯vaw¯‡Z gviv hvIqv
mg‡bi cv‡q AmsL¨ AvNv‡Zi
wPý| mšÍv‡bi GB nZ¨vKv‡Û
wKQB Kivi †bB Amnvq evevi

কয়েকটি ভাঙা অস্ত্র আর ফেনসিডিল উদ্ধারের দায়িত্ব র‍্যাবের হওয়া উচিত নয়। র‍্যাবের গঠনতন্ত্রেও সেটা নেই। গঠনতন্ত্রে আছে সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার এবং অস্ত্র বিস্ফোরক উদ্ধারের কথা। এটা র‍্যাবের ভুলে গেলে চলবে না।

পুলিশ সন্ত্রাসীদের ধরে না, ধরতে পারে না একথা সত্যি। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পুলিশের সখ্যতার কথাও মিথ্যা নয়। পুলিশ দিয়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। তাই আর্মি বিডিআর আনা হচ্ছে বারবার। এ যেন ফুটবল খেলতে বাধ্য করা হচ্ছে ক্রিকেটারদের! ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

পুলিশের কাজ আর্মি-বিডিআর দিয়ে হয় না। পুলিশের কাজ পুলিশকে দিয়েই করতে হয়। এর জন্য পুলিশ বাহিনীর আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সরকার যদি আন্তরিকভাবে সন্ত্রাস দমন করতে চায়, তাহলে কাজে এবং কথায় মিল থাকতে হবে। সব পুলিশ খারাপ এটা কোনোভাবেই সত্যি নয়। পুলিশে এখনো ভালো মানুষ আছেন। তাদেরকে পুরস্কৃত করে ব্যবস্থা নিতে হবে অসৎদের বিরুদ্ধে। পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের অনেক প্রস্তাব সরকারের দপ্তরে ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে আছে। এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করলে পুলিশ বাহিনী একটি সিস্টেমের মধ্যে চলে আসতো। কোনো সরকারই সেটা করতে চায় না।

সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে লেখাটা শুরু হয়েছিল। শেষ করা যাক তাদের নিয়ে একটি কৌতুক ও কৌতুকের রূপান্তরের মাধ্যমে।

প্রায় দেড় বছর পর বাড়ি ফিরেছে এক সৈনিক। সে তার পুরনো গার্লফ্রেন্ডের বাসায় গেল। গার্লফ্রেন্ড তো খুশিতে আটখানা।

সে তার সৈনিক প্রেমিকের প্রিয় আইসক্রিম বানালো।

সৈনিক বললো, আগে খুব খেতাম, এখন খাই না। উইল পাওয়ার আছে না। বাদ দিতে পেরেছি।

এরপর আনা হলো স্কচ হুইস্কি। প্রেমিকার অফার এবারও প্রত্যাখ্যান করলো সৈনিক। বললো, উইল পাওয়ার থাকলে এসব বাজে জিনিস খাওয়া বাদ দেয়া যায়। প্রেমিকা এরপর সিগ্রেট অফার করলো। সৈনিক সেটাও প্রত্যাখ্যান করলো। শেষমেশ প্রেমিকা নিজেকে সঁপে দিয়ে বললো, 'এবার তাহলে আমাকেই নাও।' এবারও সৈনিক প্রেমিক প্রত্যাখ্যান করলো। কষ্টমাখা ভঙ্গিতে বললো, শেষের ব্যাপারটা উইল পাওয়ার দিয়ে বন্ধ করে রাখছি না। এটা আমার পাওয়ার ফেইলিওর!

কৌতুকটা রূপান্তর করলে যা দাঁড়াবে-

সাংবাদিক : ব্রাভো। কনগ্র্যাচুলেসন্স। কিভাবে আটকাতে পারলেন পিচ্চি হান্নানকে?

র‍্যাব : সিম্পলি উইল পাওয়ার।

সাংবাদিক : কিভাবে গ্রেপ্তার করতে পারলেন যৌনকর্মীদের? তাদের তো...

র‍্যাব : আমাদের উইল পাওয়ার দারুণ স্ট্রং।

সাংবাদিক : কিভাবে ধরে ফেলছেন হেরোইঞ্চিদের? উদ্ধার করছেন ফেন্সিডিল?

র‍্যাব : ঐ তো, স্রেফ উইল পাওয়ারের জোরে।

সাংবাদিক : তাহলে নিটেল, দেবাশীষ, সুমন, শাহাজাহান জুম্মন, মো: আলী, মিনার এদের 'হার্ট ডিজিজ'-এ মৃত্যুটাও ঠেকিয়ে দিন না? যাতে এরা সন্ত্রাসী হলেও অন্তত এরশাদ শিকদারের মতো এদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারটা যেন করা যায়।

র‍্যাব : দিজ টাইম উই হ্যাভ 'পাওয়ার ফেইলিওর'। বাট ঘাবড়াও মাত্। ফেইলিওর ইজ দ্য পিলার অব সাকসেস!

আমাদের জীবনে বিনোদনের বড় অভাব। শিবরাম বা টেনিদার মতো লেখক নেই আমাদের সমাজে। মানুষ দিন দিন হয়ে পড়ছে গম্ভীর। ভুলে যাচ্ছে হাসতে। কিছুটা হলেও শিবরাম, টেনিদার অভাব পূরণের দায়িত্ব নিয়েছে র‍্যাব। তাদের রিপোর্ট কার্ড দেখে মানুষ আবার হাসতে শুরু করেছে।

এটাই র‍্যাবের সাফল্য!

মহাখালীর নিউ ডিওএইচএসে বসবাসরত পরিচিত এক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা বলেছেন, আগে থানা পুলিশের পেট্রল টিম যে কাজ করতো; কালো পোশাক, কালো চশমা, কালো টুপি পরা যমদূত চেহারার র‍্যাব সদস্যরা এখন সেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাসা-বাড়িতে কমান্ডো অভিযান চালিয়ে তারা দেহপসারিণীদের ধরছে। র‍্যাবকে এখন থেকে তাই র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন না বলে 'রেজিমেন্ট অ্যাগেইন্স্ট ব্রোথেল' বলাই ভালো হবে!